ছোট গল্প

# জয়পরাজয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখনো চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যে দিন কোনো নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন সে দিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের বাতায়নবর্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবশে করিতে পারে। যেন তিনি কোনো-এক অগম্য নত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখনো ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখনো নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোনার নূপুর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে। সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কী সৌভাগ্য কী অনুগ্রহ কী করুণার মতো করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণদুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু, যে ছায়া দেখিয়াছিল, যে নূপুর শুনিয়াছিল, সে কাহার ছায়া, কাহার নূপুর, এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখনো উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল এমনও বোধ হইত না, যদি-বা আবশ্যক ছিল এমন হয় কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙিন কাপড় এবং কানে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোনো উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।



www.bengaliebook.com

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোনো অপরাধ ছিল না। ম রীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরো একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত, "আ সর্বনাশ!"

আবার কবির বসন্তবর্ণনার মধ্যে 'মঞ্জুলবঞ্জুলমঞ্জরী' এমনতর অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন-কি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল।

রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়োই আমোদ বোধ করিতেন - তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন।

রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়।"

কবি উত্তর দিতেন, "না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্য মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া যায় - খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়। জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া - প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ – সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিনা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত – তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত – এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখনো কখনো একটা ছায়া পড়িত, কখনো কখনো একটা নূপুর শুনা যাইত।

২

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিজয়ী কবি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন, “এহি এহি।”

কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন, “যুদ্ধং দেহি।”

রাজার মান রাখিতে হইবে, যুদ্ধ দিতে হইবে; কিন্তু, কাব্যযুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালোরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্র নাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

প্রত্যুষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই; নগরে আর-সমস্ত কাজকর্ম একেবারে বন্ধ।

কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুলতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন; পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শেখর একবার অন্তঃপুরের বাতায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন - বুঝিতে পারিলেন, সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই ঊর্ধ্বলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন; মনে মনে কহিলেন, ‘আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবী, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারই নামের সার্থকতা হইবে।’

তূরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুকবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরৎপ্রভাতের শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফোরিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ ঊর্ধ্বে হেলাইয়া, বিরাটমূর্তি পুণ্ডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না – বৃহৎ সভাগৃহের চারি দিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কত দিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ কত যমক।

পুণ্ডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন কিছুণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগৃহ তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্বাক বিস্ময়রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহু দূরদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে 'সাধু সাধু' করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকরুণ সংকোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকরঞ্জণার্থে দ্বিতীয়বার অগ্নি-পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সীতা যেন এইরূপভাবে চাহিয়া এমনি করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইল, 'আমি তোমারই। তুমি যদি বিশ্বসমে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও তো করো। স্তু – ' তাহার পরে নয়ন নত করিলেন।

পুণ্ডরীক সিংহের মতো দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারি দিকে ব্যাধবেষ্টিত হরিণের মতো দাঁড়াইল। তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প - দেখিলে মনে হয়, ভাবের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মতো কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধহয় কেহ ভালো করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন - যেখানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণপ্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধবিগ্রহ, শৌর্যবীর্য, যজ্ঞদান, কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দূরস্মৃতিবদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্তিমান করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন - যেন দূর দূরান্তর হইতে শতসহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এই অতিপুরাতন প্রাসাদকে মহাসংগীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল - ইহার প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, ঊর্ধ্বে অন্তঃপুরের বাতায়নসম্মুখে উত্থিত হইয়া রাজলক্ষ্মীস্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোল্লাসে শতশতবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, "মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি, কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে।" এই

বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে-অভিষিক্ত প্রজাগণ 'জয় জয়' রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃপ্ত গর্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে।" সকলে এক মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন – বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ, অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ো। ব্রহ্মা চারি মুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না; পঞ্চানন পাঁচ মুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন।

এমনি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্বার বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে।"

দর্পভরে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেহ কোনো উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ 'সাধু সাধু' 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল; রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মতো সভা ভঙ্গ হইল।

৩

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন – বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথায় বাজিতেছে, একবার মনে হইল, দক্ষিণপবনে বাজিতেছে ; একবার মনে হইল, উত্তরে গিরিগোবর্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে; মনে হইল, উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে ; মনে হইল, অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে ; মনে হইল, যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল ; মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র – অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে , পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্বত্র বাজিতে লাগিল – বাঁশি কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কী বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না ; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপ প্রতিপ ভুলিয়া, যশ-অপযশ জয়পরাজয় উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্ত ভুলিয়া, শেখর আপনার নির্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ময়ী মানসী মূর্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দুটি কমলচরণের নূপুরধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মতো বসিয়া পড়িলেন তখন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্যে, একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল – কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসনসম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন, “রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।” বলিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন



www.bengaliebook.com

করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।" বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনি তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন, রাধা প্রণব ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যানযোগ, এবং বৃন্দাবন দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী বিন্দু। ইড়া, সুষুন্মা, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। 'রা' অর্থেই বা কী, 'ধা' অর্থেই বা কী, কৃষ্ণ শব্দের 'ক' হইতে মূর্ধন্য 'ণ' পর্যন্ত প্রত্যেক অরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে, তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন, কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি; একবার বুঝাইলেন, কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়দর্শন; তাহার পরে বুঝাইলেন, কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তরপ্রত্যুত্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ।

এই বলিয়া রাজার দিকে, পণ্ডিতদের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন।

রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং কৃষ্ণরাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশির গান, যমুনার কলোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রঙটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন; ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সে দিন সভা ভঙ্গ হইল।

৪

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, শোকোত্তর,

বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তার, অর্থগুঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে- সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল – তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্বসাধারণে ব্যবহার করিত। আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহাতে কোনো গুণপনা নাই; যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না – নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতনও নহে দুরূহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না সুবিধাও হয় না। কিন্তু, আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার, কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দিকবর্তী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষ দিন। আজ জয়পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই ‘আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না, তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।’

শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কেবল এই ক’টি কথা বলিলেন, “বীণাপাণি, শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মলভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ



www.bengaliebook.com

অমৃতপিপাসী তাহাদের কী গতি হইবে।” মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণস্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে জালায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক সশব্দে হাস্য করিলেন, এবং শেখর-শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শোক রচনা করিয়া গেলেন।
বলিলেন, “পদ্মবনের সহিত খরের কী সম্পর্ক এবং সংগীতের বিস্তর চর্চা সত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফললাভ করিয়াছে। আর, সরস্বতীর অধিষ্ঠান তো পুণ্ডরীকেই, মহারাজের অধিকারে তিনি কী অপরাধ করিয়াছিলেন যে, এ দেশে তাঁহাকে খরবাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে।”

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল - তাঁহাদের দেখাদেখি সভাসুদ্ধ সমস্ত লোক, যাহারা বুঝিল এবং না-বুঝিল, সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বার বার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। স্তু, শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন - সভাস্থ সকলেই ‘ধন্য ধন্য’ করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এক কালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কণ নূপুরের শব্দ শুনা গেল- তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫



www.bengaliebook.com

কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক করিয়া রাখিলেন। অনেক দিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়। কতগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল!" ইহার মধ্যে যে কোনো সৌন্দর্য, মানবের কোনো চির-আনন্দ, কোনো বিশ্বসংগীতের প্রতিধ্বনি, তাঁহার হৃদয়ের কোনো গভীর আত্মপ্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে - আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোনো খাদ্যই রুচে না তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা-কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক - আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিপে করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বড়ো বড়ো রাজারা অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া থাকেন - আজ আমার এ কাব্যমেধযজ্ঞ।" কিন্তু, তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। "অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্বত্র বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তখনি অশ্বমেধ হয় - আমার কবিত্ব যেদিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেইদিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছি - আরো বহুদিন পূর্বে করিলেই ভালো হইত।"

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত শূন্যে নিপে করিতে করিতে বলিলেন, “তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, হে সুন্দরী অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে, হে মোহিনী বহ্নিরূপিণী, যদি সোনা হইতাম তো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম-কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবী, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।”

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালোবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি সাদা ফুল - জুঁই বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারি দিকে প্রদীপ জ্বালাইলেন।

তাহার পর মধুর সঙ্গে একটা উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল।

কবি নিমীলিতনেত্রে কহিলেন, “দেবী, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি। এত দিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে।”

একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, “কবি, আসিয়াছি।”

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন; দেখিলেন শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্তি।

মৃত্যুসমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুল নেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল, তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, “আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।”

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন, “রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।”

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

কার্তিক, ১২৯৯ বঃ



www.bengaliebook.com